বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য

উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
(সংক্ষিপ্তসার)

গবেষক

জয়া বিশ্বাস

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু

অধ্যাপক ড. সৌভিক মজুমদার

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৩২

২০২২

।। বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য ।।

রাঢ়বঙ্গের মধ্যমণি সুপ্রাচীন জেলা বর্ধমান তার নামটির পরিপূর্ণ সার্থকতা বহন করে চলেছে। জ্ঞান গরিমায়, শিল্প সম্পদে বর্ধমান ক্রম-বর্দ্ধমান। ভারতের নবজাগরণের প্রথম বার্তাবহ রূপে বর্ধমান সারা রাজ্যে তার গৌরব আজও অম্লান রাখতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের গবেষণা প্রকল্পের মূল বিষয়বস্তু হল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত **'বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য'**।

বর্তমান কালে গবেষণা কর্ম শুধু নিজস্ব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই নয়, জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে গবেষণা কর্ম একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। আজ দেশের বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই অগ্রগতি গবেষণালব্ধ ফলাফলের সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল।

তথ্য প্রামাণ্য যেমন গবেষণা কর্মের একটি বৈশিষ্ট্য, তেমনি অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্যতা। সুতরাং, এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তথ্য ও যুক্তির সুসামঞ্জস্য এবং স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও সতর্ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ্যে সত্য আবিষ্কারই গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য।

গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য- সংগৃহীত উপাদানগুলি বিশ্লেষণ ও পুনর্বিশ্লেষণ করে নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তাদের সত্যতা যাচাই করা ও সেই সত্যের ওপর ভিত্তি করে নিজ চিন্তাভাবনা ও মন্তব্যসহ বিষয়টি পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করা, এবং বিষয়টির ওপর নতুন আলোকসম্পাত করা। এরপর আসা যাক আমাদের মূল গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পর্কিত আলোচনায়।

গবেষণা সন্দর্ভটির প্রথমেই 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে, গবেষণাটি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য যে সকল জ্ঞানীগুণী এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে। এরপর 'মুখবন্ধ' অংশে গবেষণাপত্রের বিষয়টি নির্বাচনের কারণ, কীভাবে গবেষণা কার্যটি অগ্রসর হয়েছে, গবেষণা কার্য চলাকালীন কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করার পর সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে যে সকল বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার কার্যটি কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে, সেই বিষয়টিও সংক্ষেপে উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও উপর্যুক্ত বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যাঁদের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা আমায় প্রতি মুহূর্তে উৎসাহিত করেছে, সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখও করা হয়েছে।এরপর 'গবেষণা পদ্ধতি' সম্পর্কে কিছু জরুরি তথ্য আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিতে যেহেতু সাহিত্যিক উপাদান, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক উপাদান সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে, তাই প্রতিটি উপাদান সংগ্রহ এবং তার থেকে ভাষ্য নির্মাণ করার সময় আমাকে যুগপৎ একাধিক পদ্ধতি তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়েছে। উক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদের মূল গবেষণাপত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনাটি দীর্ঘায়িত করা গেলনা, আমাদের মূল গবেষণা পত্রে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মূল গবেষণাপত্রে যে অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে, তার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, এবং আমাদের গবেষণা কার্যের কেন্দ্রীয় বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণা কার্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক। তাই বিষয়টি নির্বাচনের পরই আমাদের প্রাথমিক কাজ ছিল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সেখানকার মন্দিরগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া।

আমরা আমাদের গবেষণার মূল বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পরবর্তী আলোচনার দিকে অগ্রসর হব। সমগ্র গবেষণা প্রকল্পের বিষয়টিকে দু'টি বিভাগ এবং অধ্যায়গুলির নামকরণ করা হয়েছে এইভাবে-

প্রথম বিভাগ - **তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ**

প্রথম অধ্যায়- বর্ধমান জেলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়- বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পেক্ষাপট।

তৃতীয় অধ্যায়- বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ।

চতুর্থ অধ্যায়- বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস ও রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়- মধ্যযুগে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।

দ্বিতীয় বিভাগ - **ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহ**

প্রথম অধ্যায়- বর্ধমানের মন্দির সমূহের তালিকা প্রণয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়- নির্বাচিত মন্দিরের পৃথকভাবে তথ্য সমূহের আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়- মন্দির সজ্জার বিষয়বস্তু ভিত্তিক আলোচনা।

কথাশেষ-

পরিশিষ্ট-

মানচিত্র

ব্যক্তিগত চিত্র

চিত্রসূচী

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথমেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পের **প্রথম বিভাগের** প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা যাক। **প্রথম অধ্যায়ের** বিষয়বস্তু হল- **'বর্ধমান জেলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য'**। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। যেমন- **আয়তন ও চতুঃসীমা, ভূ- প্রকৃতি, নদনদী ও জলবায়ু, কৃষিজ ও অরণ্য সম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা** ইত্যাদি।

আয়তন ও চতুঃসীমা- এই অংশে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী, ইংরেজ আমল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বর্ধমান জেলার আয়তন, বিস্তৃতি, আকার এবং চারপাশে কোন কোন অঞ্চল অবস্থান করছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া জেলাটির মহকুমা, থানা, ব্লক এইগুলি সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ভূ- প্রকৃতি, নদনদী ও জলবায়ু - এই অংশে বর্ধমান জেলার ভূ- প্রকৃতির গঠন অনুসারে যে ভাগগুলি রয়েছে এবং উক্ত জেলায় কোথায় কেমন ধরনের মৃত্তিকা দ্বারা অঞ্চলগুলি গঠিত হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চল গুলির নামসহ আলোচনা করা হয়েছে।

নদ- নদী প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার প্রধান- প্রধান নদ- নদী গুলির নাম এবং তাদের পুরনো গতিপথ ও বর্তমান গতিপথের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। কোন কোন নদীর ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের থেকে

উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; এছাড়া নদীগুলি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলার প্রধান নদ দামোদর; তাই এই নদ'কে কেন্দ্র করে যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনার পর, বর্তমানে নদ-নদীগুলির পরিস্থিতি এবং জেলার মানুষদের উপর সেগুলির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর জেলার জলবায়ু, গ্রীষ্ম ও শীত কেমন থাকে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কর্কটক্রান্তি রেখা জেলার প্রায় মধ্যস্থান দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষিজ ও অরণ্য সম্পদ - এই অংশে বর্ধমান জেলার প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কোন উপায়ে সম্ভব হবে, সেই সম্পর্কেও সামান্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

এরপর উক্ত জেলার বনজ সম্পদ বিষয়ক আলোচনায়, বনাঞ্চলগুলির ভাগ সম্পর্কেও বলা হয়েছে; বনভূমির বিস্তার, পরিমাণ ও বনভূমির উন্নয়ন কোন উপায়ে সম্ভব, সেই বিষয়েও তথ্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বনভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বনভূমির উপর নির্ভরতা হ্রাস করার ব্যাপারেও জোর দেওয়া হয়েছে।

শিল্প - বর্ধমান জেলায় ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহৎ শিল্প এবং খনিজদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা গঠিত শিল্পের সমাহার দেখা যায়, যা অন্যকোন জেলায় প্রায় দেখা যায় না। এই অংশে বস্ত্রশিল্প, তামা পিতল শিল্প নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উল্লেখও করা হয়েছে। তবে সর্বোপরি কয়লা কেন্দ্রিক শিল্পকেই অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কারিগরি শিল্পের যে রূপান্তর ঘটেছে, সেই বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি শিল্প যাতে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠতে পারে, এবং গ্রামীণ সমাজকে শিল্পনির্ভর করে তোলার স্বপক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা - পূর্বে বর্ধমান জেলার জলপথ যে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল, সেই বিষয়ে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। এছাড়া স্থলপথ অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাগুলি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বর্ধমানের মহারাজা যে সড়কপথটি তৈরি করিয়ে ছিলেন, সেই সম্পর্কিত তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি ১৯৬০খ্রিঃ'র পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অতীতে নির্মিত বিভিন্ন সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থাতে দ্রুততা এনে দিয়েছিল, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমশ অলাভজনক এবং বিপদজনক হয়ে ওঠে, ফলে ইংরেজরা পূর্ব ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। উক্ত বিষয়ে আমাদের মূল গবেষণা প্রকল্পে আলোচনা করা হয়েছে। তবে অতীতের তুলনায় বর্তমানে বর্ধমান জেলায় সড়কপথের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যানবাহন হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাস, অটো ইত্যাদির সংখ্যা; অনুরূপ ভাবে রাস্তাঘাটের মানও নিম্নগামী হয়েছে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা জেলাটির শিল্পের ওপরেও প্রভাব ফেলেছে, তা বলাইবাহুল্য। মূলত উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে **'বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য'** বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের **দ্বিতীয় অধ্যায়ের** বিষয়বস্তু হল- **'বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পেক্ষাপট '**। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বর্ধমানও হারিয়ে ফেলেছে তার উৎস ও প্রাচীনত্বের সঠিক তারিখ। ইতিকথা ও উপকথার সম্মেলনে সৃষ্ট জটিল আবর্তে অনেক তথ্যই আজও প্রকাশের অন্তরালে

রয়েছে। বর্তমান বর্ধমান জেলা রাঢ়ের একাংশ জুড়ে অবস্থিত, ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৯ খ্রিঃ এর সৃষ্টি। কিন্তু অতীতে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ যুগের প্রথমে বহুবার বর্ধমানের সীমার পরিবর্তন হয়েছে। কখনও পার্শ্ববর্তী বিরাট এক এলাকা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আবার কখনও এর আয়তন ছোট হয়েছে। নতুন নতুন রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বত্রই এরূপে ভাঙাগড়া চলে থাকে।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিমালা গুলি থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হবে। প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত রচিত অসংখ্য ধ্রুপদী সাহিত্যে **'বর্ধমান ভুক্তি'**র উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বৈষ্ণব লেখকগণ ও অন্যান্য কবিদের রচিত কাব্য-সাহিত্যে বর্ধমান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্থানীয় নামের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, বর্ধমান জেলাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বর্ধমান শহরের আশেপাশে বর্গীদের অত্যাচারের প্রসঙ্গটিও উল্লেখিত হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে। মূলত আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম হতে বর্ধমানের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে পাঞ্জাব হতে আগত একজন ব্যবসায়ী পরিবার মোঘল শাসনকর্তার সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক স্থাপন করে কালক্রমে এক বিশাল জমিদারীর মালিক হয়ে বর্ধমানের মহারাজা নামে খ্যাতিলাভ করেন। কালক্রমে বর্ধমানের স্বতন্ত্র ইতিহাস বর্ধমানের জমিদার বা রাজবংশের ইতিহাসে পরিণত হয়। মোঘল যুগের শেষদিকের এবং ব্রিটিশ যুগের বর্ধমানের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস। বর্ধমানের ইতিহাস যে একটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়, গোটা বাংলার ইতিহাসের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপূরক মাত্র, এই তথ্যটিই আমাদের মূল গবেষণা পত্রের উক্ত অধ্যায় জুড়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এরপর আমাদের **তৃতীয় অধ্যায়ের** বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা যাক। আমাদের **তৃতীয় অধ্যায়ের** বিষয় হল- **'বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ'**। বর্ধমান জেলার মানুষের সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করতে হবে। যেমন- বর্ধমের জনগোষ্ঠী, বাসস্থান বা বাসগৃহ, পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধনী, খাদ্যাভাস, ভাষা, জীবিকা, ক্রীড়া, শিক্ষা ব্যবস্থা, উৎসব ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যের উদাহরণের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের মূল গবেষণা পত্রটিতে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবর্তিতগতি প্রবাহের ন্যায় আঞ্চলিক অর্থনীতির ধারাও পরিবর্তনশীল। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যের মাধ্যমে তৎকালীন বর্ধমান জেলার অর্থনীতির একটি পরিস্ফুট চিত্র পাওয়া যায়। মধ্যযুগ থেকে কীভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিবর্তন হয়েছে সেই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলার ধর্মীয় বাতাবরণ সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে বলা যায় যে, অতীতে বর্ধমান পূর্বভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, ধর্মচর্চা ও আচার নিষ্ঠার দিক দিয়ে একটি স্থান অধিকার করে ছিল। একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মাচার্যেরা এই পুণ্যভূমি থেকে তাঁদের মতবাদ প্রচারিত করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন বৌদ্ধধর্মগুরুরা ও জৈননাথচার্যেরা। আবার ইসলাম ধর্মাবলম্বী গুরুদের প্রভাব ও এই জেলার উপর যথেষ্ট পড়েছিল। তাই বলাই যায় যে, বর্ধমানের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির একটি মিলিত রূপ। সমস্ত ধর্মের মূল তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করে বর্ধমানের ধর্ম সংস্কৃতি একটি বিশিষ্টরূপ পেয়েছিল। প্রাচীনকালের তুলনায় বাংলার মধ্যযুগে বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মীয় বাতাবরণে বিশেষ রূপান্তর দেখা গিয়েছিল। সেই রূপান্তরের একটি বিশেষ কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের মূল গবেষণা পত্রে করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বাতাবরণ সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই অধ্যায়ে বর্ধমান জেলার সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- ছেলে ভুলানো ছড়া, লোকনৃত্য, লোকগীতি, লোকনাট্য, মেলা ইত্যাদি। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই তথ্যই উপস্থাপন করতে চেয়েছি যে, বঙ্গদেশের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি নিহিত আছে বাংলার গ্রাম সমূহে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে গ্রামবাংলার রূপ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। বর্ধমানের মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, কীর্তন, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ ও যৌগিক সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের পথ ধরেই এগিয়ে চলে সংস্কৃতির প্রভাব।

আমাদের **তৃতীয় অধ্যায়ের** বিষয়টি সম্পর্কিত তথ্যের কোনো অভাব নেই। বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এই প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা দ্বারা এর বিভিন্ন দিক গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আলোচনাটিকে দীর্ঘায়িত ও সম্পূর্ণ একটি রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে আমাদের মূল গবেষণা পত্রে।

আমাদের **চতুর্থ অধ্যায়ের** আলোচনার বিষয়বস্তু হল- **'বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস ও রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি'।** বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস অনেকটাই প্রাচীন আর বিস্তৃত। এই জমিদার বংশের আদিপর্বের কাহিনি সবিশেষ জানা যায় না। তবে প্রবাদ আছে যে, তৎকালীন (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) **পাঞ্জাব** প্রদেশের **লাহোরের** অন্তর্ভুক্ত **কোটলি মহল্লার** প্রখ্যাত ব্যবসায়ী **সঙ্গম রায়,** শ্রী শ্রী জগন্নাথ দর্শন করে পুরী হতে সপরিবার প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমানের নিকট বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে আবাসস্থল নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। সঙ্গম রায়ের পর তাঁর পুত্র **বঙ্কুবিহারী রায়** পৈত্রিক ব্যবসায় লিপ্ত হন সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথমের দিকে; তখন দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭খ্রিঃ)। ১৬৫৭ খ্রিঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বর্ধমানে সঙ্গম রায়ের তৃতীয় পুরুষ **আবু রায়** পিতার ব্যবসায়ে যুক্ত হন। আবু রায় জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পান সম্রাট শাহজাহান এর নিকট হতে। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের এই ক্ষত্রিয় পরিবার **'রাজবংশ'** হিসাবে পরিগণিত হয় এই সময় থেকেই।

বহুপূর্বে বর্ধমান শহর বলতে ঘন বসতি, ব্যবসা বাণিজ্য, কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পন্ন **কাঞ্চননগর** অঞ্চলকেই বোঝাত। এমনকি আদিতে বর্ধমান রাজ পরিবারের পূর্ব পুরুষের বাসস্থান ও রাজধানী ছিল এই **কাঞ্চননগরের বারোদ্বারী** তে। যখন কাঞ্চননগর থেকে বর্ধমান শহর পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছে এবং রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন বিশাল রাজপরিবারের কীর্তি বর্ধমানে ও বাইরে বহু জায়গায় বিস্তৃত হয়েছে। বহু স্থাপত্য, মন্দির ও দর্শনীয় মনোরম কীর্তি তৎকালীন রাজাদেরই অবদান। এক এক রাজার আমলে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রজাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। **রাজা তেজচাঁদ** বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। তাঁর অর্থানুকুল্যে এবং উদ্যমে বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারে বর্ধমান রাজপরিবার যেমন উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি নারী-শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁদের অবদান কম ছিল না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাজদরবারে বাইরে থেকেই সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্য-কাব্য সভায় পন্ডিতদের আনাগোনা হত। অন্যান্য নান্দনিক শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহু নামীগুণী শিল্পীর সমাবেশ এই শহরে ছিল। তাঁদের মধ্যে সকলেই যে বর্ধমানের মানুষ তা নয়, বাইরে থেকে এসে বর্ধমানে থাকতেন এবং চর্চা করতেন। নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যকলা, কারুকলা ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ও শিল্পীরা সর্বপ্রকার সংস্কৃতির চর্চা ও উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধমান রাজসভার আশ্রয়ে ব্যাপক সাহিত্য কর্ম হয়েছিল। যা বঙ্গ সাহিত্যের ভান্ডারকে

পূর্ণতা দিয়েছিল। বর্ধমান রাজবংশের রাজাগণ সমগ্র বর্ধমান জুড়ে প্রচুর দেবালয় নির্মাণ, এছাড়া বিভিন্ন প্রকার সমাজসেবামূলক কার্যের দ্বারা বর্ধমানবাসীর নিকট স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁদের কীর্তি এবং দেবালয় নির্মাণের একটি তালিকা মূল গবেষণাপত্রের উক্ত অধ্যায়ের সমাপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বর্ধমান রাজাদের বিভিন্ন কীর্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অবশেষে বলা যায় যে, জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির ফলে অন্যান্য জমিদারদের মতোই বর্ধমানে রাজাদের প্রতাপ ও জৌলুষ ম্লান হতে থাকে। ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন এই রাজবংশ আজও বর্ধমান জেলায় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের **পঞ্চম অধ্যায়টি** হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল- **'মধ্যযুগে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য'**। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে একটি আলোচনা করা হয়েছে আমাদের মূল গবেষণা পত্রে। তা না হলে মধ্যযুগের মন্দিরগুলির স্থাপত্য শৈলী ও ভাস্কর্যের উপর প্রাচীন যুগের কতটা প্রভাব পড়েছিল, কতটাই বা সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য রয়েছে অথবা পূর্বের কোনো মন্দির নির্মাণ রীতি পরবর্তীকালে সামান্য কোনো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে অন্য কোনো শৈলী হয়ে উঠেছে কিনা সেই সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তবে এই স্বল্প পরিসরে সম্পূর্ণ বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, তাই আমরা সরাসরি আমাদের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপটির উপর আলোকপাত করব।

আর্য সভ্যতার প্রভাবে আসবার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থাপত্যের রূপ কী ছিল সে কথা জানবার আজ আর কোনো উপায় নেই। আর্য ভাবধারা প্রকাশের সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে এসে সমগ্র প্রদেশটিকে প্লাবিত করে ফেলল। ভাবের দিক দিয়ে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্থানীয় ধর্মচিন্তার সঙ্গে আপস করে নিয়ে যে বিস্তৃত ও উদার পরিবেশ রচনা করেছিল তার প্রভাব প্রাথমিক অবস্থায় কীভাবে এবং কতটা বাংলার মন্দির রচনা রীতিকে প্রভাবিত করেছিল যে কথা আজও অজ্ঞাত।

পঞ্চদশ শতকে বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরিবর্তনটা প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল মুসলমানগণের ধর্মীয় স্থাপত্যে। এই সময়ে প্রায় শতাধিক বছর পর গাঙ্গেয় বাংলায় নতুন করে মন্দিরচর্চার সূত্রপাত হয়। এই সময়ে যে ধর্মীয় স্থাপত্যে যে পরিবর্তিত ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তার সঙ্গে এই নতুন মন্দিরচর্চার ধারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রে আবদ্ধ।

নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চার বিকাশ হয়েছিল অনেক ধীর গতিতে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চা সবদিক থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে বলা যায়। উর্দ্ধাংশের আকৃতি অনুসারে নব পর্যায়ের মন্দির গুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগটি **'চালা'**, দ্বিতীয়টি **'রত্ন'**, তৃতীয়টির নাম **'শিখর'**।

'চালা' শ্রেণির মন্দির গুলির বিশেষ বৈশিষ্ট হল একটি বর্গাকৃতি ভূমি মাপের চারদিকে চারটি দেওয়াল নির্মাণ করে তার ছাদটি বাঁশ বা খড় দিয়ে নির্মিত মাটির বাড়ির চালের মতো তৈরি করা হত। সামনে চালা নামলে **দোচালা**, আর চারদিকে চালা নামলে **চারচালা**, আবার চারচালার উপর একটি ছোট চারচালা তৈরি করে **আটচালা** মন্দির নির্মাণ করা হত। চালা মন্দিরের একটি বিশেষ শ্রেণি হল **জোড়বাংলা**। এটি হল দুটি পরস্পর সন্নিবিষ্ট দোচালা মন্দিরের সমন্বয়। মূলত এই মন্দিরের উদ্ভব হয়েছিল একটি দোচালা গর্ভগৃহ হিসাবে ও অপরটি ভোগমন্ডপ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু এই তত্ত্ব সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বর্ধমান জেলার কালনার সিদ্ধেশ্বরী দেবী মন্দিরের নাম করা যায়, এটি একটি জোড়বাংলা মন্দির।

চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলার **'রত্ন'** মন্দিরের উদ্ভব যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার সনাতন চালাশৈলী ও ভারতীয় নগর স্থাপত্যের **পীড় দেউল**, এই দুই এর সংমিশ্রণে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় এই অভিনব

স্থাপত্য শৈলী জন্মলাভ করে। এই শৈলীটির বৈশিষ্ট্য হল মূলত একটি চারচালা মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি পীড় দেউল বা রত্ন স্থাপন করা।

এই রত্নটি চতুষ্কোণ, গোলাকৃতি বা অষ্টকোণাকৃতি যে কোন আকার নিতে পারত। রত্ন মন্দির মূলত হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শনের একটি আশ্চর্য সংমিশ্রণ। কালনার লালজী মন্দির পঁচিশরত্নচূড়া মন্দিরের উদাহরণ। ডেভিড ম্যাককাচ্চন *(DAVID J. McCUTCHION)* **'একরত্ন'** কে রত্নরীতির সহজতম গঠন বলে মনে করেছেন, যা একটাই শীর্ষ চূড়া সম্বলিত। এছাড়াও চারটি কোণে আরও চারটি শীর্ষ চূড়া নিয়ে মন্দির হলে তাকে পঞ্চরত্ন বলে। এইভাবে রত্নের সংখ্যা গুণিতকে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

'চালা', 'দেউল' 'রত্ন' শৈলীর মন্দির সতেরো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে অজস্র তৈরি হয়। এগুলি ছাড়া **'দালান'** ও **'চাঁদনি'** শৈলীর মন্দিরও প্রচুর তৈরি হয়। সমতল ছাদ এবং সরল কার্নিশ যুক্ত মন্দির 'দালান' ও 'চাঁদনি' দুটি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

চালা কুটিরের অনুকরণে সৃষ্ট নিম্নাংশের উপর ঐতিহ্যগত গম্বুজ বসিয়ে মুসলমানগণ যে স্থাপত্যরূপের সৃষ্টি করেছিলেন রত্ন মন্দির তারই পরিবর্তিত রূপ। গম্বুজের পরিবর্তে হিন্দুরা ব্যবহার করলেন ঐতিহ্যগত শিখর মন্দিরের আকৃতি।

স্থাপত্য শৈলীর অঞ্চল বিশেষে একই কালে কিছু রূপান্তর লক্ষ করা যায়। বস্তুতপক্ষে চালা, রত্ন, দেউল, দালান, চাঁদনি এই পাঁচটি নির্দিষ্ট শৈলীর মন্দির অসংখ্য নির্মিত হলেও আরও অনেক শ্রেণিভেদ অঞ্চল ও কালভেদ উদ্ভূত হয়। এই মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের মূল গবেষণা পত্রে।

মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ও মন্দির নির্মাতাদের সম্পর্কে বলে গেলে বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বাংলার মন্দিরে সাধারণত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন অন্তর্বর্তী রাজারা, অষ্টাদশ শতকে জমিদার ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জীবিকার লোকেরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অষ্টাদশ শতক থেকেই রাজাদের অর্থবল কমতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান রাজাদের আনুকূল্যে নির্মিত কালনার মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের পর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির ক্ষেত্র।

উনিশ শতকের মন্দিরে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ শুধু নন, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ মন্দির নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বর্ধমানের কুলিন গ্রামের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত গোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বসুবংশ ছিলেন কায়স্থ বৃত্তিজীবী।

চৈতন্যের আন্দোলনের ফলেই সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়-বঙ্গে সর্বত্র নতুন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিকশিত হয়। বর্ধমানে স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ শাক্ত, শৈব দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মিত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় সতের-আঠারো শতক তো বটেই, উনিশ শতকেও যেসব দেবালয় তথা টেরাকোটা মন্দির নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে, তার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ অথবা শালগ্রাম শিলারূপী বহুবিধ নামের বিষ্ণুর উপাসনার জন্য সেগুলিতে কৃষ্ণলীলা ভাস্কর্য যে অগ্রাধিকার পাবে এমনই স্বাভাবিক।কিন্তু একথা লক্ষণীয় যে, সমকালীন শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মীয় সম্প্রীতি অবশ্যই এর অন্যতম কারণ, কিন্তু অন্যান্য কারণও ছিল। **'আচণ্ডালে কোল'** দেওয়ার কালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ কোটিপতি ও প্রভাবশালী বণিককেও কোল দিয়েছিলেন। গবেষকদের কাছে একথা এখন স্বীকৃত যে বঙ্গদেশে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির, সেকালের এই বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। স্থপতি ও ভাস্কর যারা হাতে হাতিয়ারে এমন পুরাকীর্তি গঠিত করেছেন- বর্ণ শাসিত সমাজের নীচুতলার অধিবাসী হওয়ার দরুন তাঁরা যে চৈতন্যের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্জিত উদার প্রেমধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল হবেন এমনই স্বাভাবিক।

বাংলার মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সৃষ্টিতে একদা বাঙালি সূত্রধর শিল্পীরা যে সৌন্দর্য সুষমার অবদান রেখে গেছেন, তা আজ বঙ্গসংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মন্দির সজ্জায় যে প্রথাগত পোড়ামাটির ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হত, তা বাঙালি শিল্পীদের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। শিল্পীরা আধ-শুকনো মাটির ফলকের ওপরে স্বল্প গভীরে এইসব মূর্তি খোদাই করতেন; তারপর তা ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে ভাঁটিতে পোড়াবার ব্যবস্থা করতেন। পোড়ানোর পর ফলক গুলিকে মন্দির সজ্জায় সাধারণত সামনের দেওয়ালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই ব্যবহার করতেন। ফলে এই পোড়ামাটির অলঙ্করণ এক সার্থক শিল্পের সৃষ্টি করত যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মত।

আমাদের দেখা টেরাকোটা মন্দিরের নজিরে বলা যায়, প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু গুলি অসংখ্য দেবালয় অলঙ্করণ অল্পাধিক পরিমাণে রূপায়িত হয়েছে। যথা- বাঙালির দেবলোক ও ধর্মজীবন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণ- মহাভারত- পুরাণ- মঙ্গলকাব্য- পাঁচালি- কীর্তন প্রকৃতির প্রভাব; পূজা- পার্বণ; সেকালের অভিজাত শ্রেণি ও ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, খেলাধুলা ও ব্যবহৃত যানবাহন প্রভৃতি; নারীপুরুষের বেশভূষা, অবসর বিনোদন প্রণালী ও গীতবাদ্য নৃত্যচর্চা; সাধারণ জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত জীবন ইত্যাদি। এছাড়া খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের বেশ কিছু দৃশ্য, বাঙালি নারীর গীতবাদ্যচর্চার দৃশ্য এবং কিছু সামাজিক বিদ্রূপাত্মক **'টেরাকোটা'** ফলক স্থান পেয়েছে।

মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপত্যের অলঙ্কারে মানুষ ও পশুর মূর্তি দেখানোর নিয়ম নেই। ফুল,ফল,লতা, পাতা ও বিভিন্ন নাম ও গুণবাচক মোটিফ ইসলামি স্থাপত্যালঙ্কারের বিষয়বস্তু। মন্দিরের স্থাপত্যালঙ্কার রচনা আরম্ভ হয়েছিল এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে। প্রথমদিকের মন্দিরে ফুলকারি নকশাই বেশি। মনুষ্য বা পশুমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কদাচিৎ। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিভিন্ন কাহিনি ও চরিত্রচিত্রণের প্রবণতা ব্যাপক হতে থাকে। অবশেষে দেখা যায় মন্দিরের গাত্রালঙ্কারে মূর্তির অংশই বেশি। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলার মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলঙ্করণ সজ্জায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীকী নিদর্শন দেখা যায়। যেমন- 'ময়ূর চঞ্চুতে আবদ্ধ সাপ', একজন পুরুষ যিনি দুহাতে দুটি সিংহ ধৃত অবস্থায় দুপায়ে পদদলিত করছেন দুটি হাতিকে, গজসিংহের ভাস্কর্য ইত্যাদি।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ঐতিহ্য বাঙালির জীবনে যে নবজাগরণের ঢেউ এনেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চৈতন্য ভক্তিধর্মে উজ্জীবিত বাঙালির শিল্পকলার স্ফুরণে কৃষ্ণলীলা রূপারোপের পাশাপাশি শ্রীচৈতন্য হয়ে উঠেছেন এক অন্যতম রূপকল্প, যার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে গ্রাম বাংলার মন্দির দেবালয়ে মূর্তিবিগ্রহের অধিষ্ঠানে ও স্থাপত্য ভাস্কর্যের অলঙ্করণে। আঠারো থেকে উনিশ শতকের বহু মন্দির গাত্রে দেখা যায় বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গীমায় সংকীর্তন দৃশ্য। এছাড়া উনিশ শতকের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ষড়ভূজ মূর্তি ভাস্কর্য পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু মন্দিরে স্থান পেয়েছে। মন্দির ভাস্কর্য সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আমাদের মূল গবেষণা পত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

মন্দিরের স্থাপত্য শৈলী ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর মন্দিরের স্থায়ীত্ব সম্পর্কিত দু'চারটি কথা বলা না হলে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ হবে না। মন্দিরের স্থাপত্য স্থায়ী না হওয়ার অনেকগুলি কারণের মধ্যে এগুলির নির্মাণ কৌশলের দুর্বলতা অন্যতম কারণ ধরে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আবহাওয়া জনিত বিভিন্ন কারণগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবং এগুলির উপরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক কারণ যেটি হল এগুলির উপর মানুষের দৌরাত্ম। যুগ যুগ ধরে সারা দেশে বহু স্থাপত্য অজ্ঞতার শিকার হয়েছে। একই সঙ্গে স্থাপত্য গুলি নষ্ট হয়ে গেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলি এইভাবে নানা কালের বিচারে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের **দ্বিতীয় বিভাগ** হল **'ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহ'**। এই অংশে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রসমীক্ষা করে সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলি সংগ্রহ করে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগের **প্রথম অধ্যায়ে** বর্ধমানের মন্দিরগুলি সমীক্ষা

করে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে বর্ধমান জেলার ৬টি মহকুমায় ব্লক অনুযায়ী মন্দিরগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- মন্দিরের নাম, গ্রাম/শহর, ব্লক, ডাকঘর, থানা, পিন এইভাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

এই বিভাগের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** বর্ধমান জেলা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যে মন্দিরগুলি তালিকাভুক্ত হয়েছে, সেই মন্দিরগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত মন্দির সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য আলোচনা করা হয়েছে ও পরিশেষে চিত্র দেওয়া হয়েছে। যেমন-

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম।
মন্দিরের গঠন শৈলী।
বিগ্রহের অবস্থান।
সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-

ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব।
খ) মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময়।
গ) আইনগত জটিলতা।
ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয়- ব্যয়।
ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা।
চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান।
ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয়- ব্যয়।
জ) ভোগ।
ঝ) পুরোহিতের বেতন ।
ঞ) ভক্ত সমাগম।
ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা।
ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
ড) প্রকাশনা।

মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগের অন্তিম অধ্যায়টির বিষয়বস্তু হল- **'মন্দির সজ্জার বিষয়বস্তু ভিত্তিক আলোচনা'**। এটিই আমাদের গবেষণা পত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উক্ত অধ্যায়ে বর্ধমান জেলার যে সকল টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি অনুসন্ধানের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছে, সেই সকল মন্দিরের আকর্ষণীয় কিছু ভাস্কর্য নির্বাচন করে সেই সম্পর্কিত তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। মন্দিরগাত্রে যে ভাস্কর্যগুলি স্থান পেয়েছে, সেইগুলিকে বিষয়ভিত্তিক ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। দুটি বিষয় আমরা সাধারণত মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে লক্ষ করতে পারি, **(ক)** পৌরাণিক এবং **(খ)** সামাজিক। 'পৌরাণিক' অংশে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী সংক্রান্ত দৃশ্যাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবং এই দৃশ্যগুলি যে মন্দিরগুলিতে লক্ষ করা হয়েছে, সেই সকল মন্দিরগুলির নাম সমেত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলকটির অবস্থান সম্পর্কীত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যাতে ঐ বিবরণ দেখে মন্দিরগাত্রে নির্দিষ্ট কোন ফলক অনুসন্ধানে সুবিধা হয়। এছাড়া পৌরাণিক দৃশ্যাবলির নেপথ্যে ইতিহাস ও দেবদেবীদের উদ্ভব ও তাঁদের পূজা প্রচারের ইতিহাস সম্বন্ধেও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, যে বিষয়গুলি পৌরাণিক ও সামাজিক দুই বিভাগেই বিদ্যমান। তাই পৃথক পৃথক ভাবে বিষয়গুলি তুলে ধরে

আলোচনাটি দীর্ঘায়িত করার পরিবর্তে একটি বিভাগেই সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, অলংকার, অস্ত্র সহযোগে যুদ্ধদৃশ্য, যানবাহন ইত্যাদি। উক্ত বিষয়গুলি সামাজিক বিভাগের মধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

'পৌরাণিক' অংশের আলোচনার পর মন্দিরগাত্রের 'সামাজিক' অংশটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত অভিজাত শ্রেণির জীবন, তাদের বিলাস- ব্যসন, শিকার দৃশ্য, অবসর-কালীন ক্রিয়াকলাপ, ব্যভিচারমূলক দৃশ্য, নারী- পুরুষ উভয়েরই পোশাক- পরিচ্ছদ, অলংকার, জুতো, পাগড়ি ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সমাজের সাধারণ মানুষের বৃত্তি, উৎসব, পূজা- অর্চনা, ক্রীড়া, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি এবং মানুষের বাসস্থান, তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি যা যা মন্দির ভাস্কর্যে শিল্পীদের কল্পনায় উঠে এসেছে সেই সকল বিষয়গুলি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। মন্দির ভাস্কর্যে 'নারী'কে বিভিন্ন রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তাই 'নারী' বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আগন্তুক বা বিদেশি নারী- পুরুষের চিত্রফলক অল্পাধিক পরিমাণে অধিকাংশ মন্দিরগাত্রেই লক্ষ করা গেছে, তাই মন্দিরগাত্রে এদের প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। 'মিথুন দৃশ্য' খুব স্বল্পসংখ্যক মন্দিরগাত্রেই লক্ষ করা গেছে, এই বিষয়ে তাই বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া গেল না। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত মন্দিরগাত্রে মিশ্রজীব, কিছু প্রতীকী নিদর্শন এবং মৃত্যুলতা দেখা যায়। তবে এগুলির সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই এই বিষয়েও আলোচনা দীর্ঘায়িত করা সম্ভবপর হল না। উক্ত অধ্যায়ের অন্তিম বিষয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত অধ্যায়গুলিতে পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনার পর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেটি হল **'চৈতন্য অনুপ্রেরণায় মন্দিরচর্চায় নবযুগ'**। শ্রীচৈতন্যদেব খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন এবং ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে গৌড়ীয় প্রেমধর্মের প্রচার করেন। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের প্রভাব অল্প- বিস্তর পড়েছিল বলা যায় কারণ, মন্দির সজ্জায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের উৎকীর্ণ চিত্রফলকই তার প্রমাণ। উক্ত বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শ্রীচৈতন্য জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর বৈষ্ণবধর্মে দিক্ষীত করেছিলেন, ফলে মন্দির নির্মাণ শিল্পীগণ আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ভক্তিধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা'কেই মুখ্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত বিভিন্ন শিল্প-স্থাপনের নিদর্শন থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনের প্রভাবেই মন্দির ভাস্কর্যে অধিক পরিমাণে রাধাকৃষ্ণলীলার চিত্রফলক উৎকীর্ণ হয়েছে এই কথা বলাই যায়। উক্ত সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত রাধাকৃষ্ণ কাহিনি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী অখণ্ড ভাববিস্তার করেছিল। সাহিত্যের এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব পড়েছিল, এমনকি শ্রীচৈতন্যদবের জীবননাট্য লোকসাহিত্য এবং সংগীতকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন- পট, পাটা, পুথির উপর অলংকরণ; সংগীতের ক্ষেত্রে ভাদু, ঝুমুর, পশ্চিমবাংলা বা রাঢ় অঞ্চলের খেমটি গান এবং পূর্ববঙ্গের ঘাটু গানে রাধাকৃষ্ণ কাহিনিই মূল বিষয়বস্তু ছিল। পরবর্তী সময়ে রাম ও কৃষ্ণলীলার মতো শ্রীচৈতন্যলীলা বাঙালি শিল্পীর নিকট ক্রমশ যে চিত্রের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেতে থাকে মন্দির ভাস্কর্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ উক্ত অধ্যায়ে মন্দির ভাস্কর্যে পৌরাণিক, সামাজিক বিষয়গুলি উত্থাপনের পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন মন্দির শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পকে কিভাবে স্পর্শ করেছিল সেই সম্পর্কিত

কিছু তথ্য আলোচিত হয়েছে। এরপর আমাদের গবেষণা প্রকল্পের অন্তিম পর্যায়টি আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।

কথাশেষ – গবেষণা প্রকল্পের 'কথাশেষ' অংশে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে, মধ্যযুগে মন্দির স্থাপত্য নির্মাণ ও সজ্জার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উৎসগুলি থেকে স্রষ্টা ও শিল্পীরা যেভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে একটি পদ্ধতি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান যা আমাদের বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য লোকায়ত উৎস থেকে যে সমস্ত সম্পদ আত্তীকৃত করেছিল তার বিশদ ও সচিত্র উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় এইসব মন্দির স্থাপত্য ও সজ্জার মধ্যে। ফলে সঙ্গত কারণেই সাহিত্য ও শিল্পের যুগ্মধারায় মধ্যযুগের বাংলায় মন্দির স্থাপত্যের চর্চা এক অতি সমৃদ্ধতর অবস্থানে পৌঁছেছিল। আমরা এই বিষয়টির উপরই আলোকপাত করতে সচেষ্ট হয়েছি।

পরিশিষ্ট- 'পরিশিষ্ট' অংশটিতে চারটি বিভাগ রয়েছে। **(ক)** মানচিত্র অংশে বর্ধমান জেলার একটি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। **(খ)** ব্যক্তিগত চিত্র অংশে মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে গবেষকের চিত্র এবং ক্ষেত্র অনুসন্ধান চলাকালীন কিছু চিত্র দেওয়া হয়েছে। **(গ)** চিত্রসূচী অংশে দ্বিতীয় বিভাগের তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কিত কিছু চিত্র সংযোজিত হয়েছে। **(ঘ)** গ্রন্থপঞ্জি অংশে গবেষণা প্রকল্পে সহায়ক গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। গবেষনা কর্মের প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজন হয় একটি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি সংকলন। এই কাজে প্রথম পদক্ষেপরূপে গ্রন্থাগারগুলিতে গিয়ে গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট বইগুলির পঞ্জি সংকলন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষ গ্রন্থাগার গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

।। গ্রন্থপঞ্জি ।।

[ক] সহায়ক সরকারি নথি

1. ***Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-13, Office of The District Magistrate & Collector, Burdwan, Government of West Bengal.***

[খ] সহায়ক বাংলা গ্রন্থ সমূহ

1. ওয়াহাব আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ডিসেম্বর ২০০৬।
2. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯।
3. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯।
4. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০।
5. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯ ।
6. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১।
7. কোঙার গোপীকান্ত, ঠাকুর দেবেশ সম্পাদিত, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়-এর বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত ও জালপ্রতাপচাঁদ মামলা; বর্ধমান; ইন্দু পাবলিকেশনস্; ২০০৫।
8. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০।

9. গাইন বিশ্বজিৎ, কালনার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; বর্ধমান; কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র; অক্টোবর ২০১২।
10. গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৭।
11. গোস্বামী কাননবিহারী, বাঘনাপাড়া- সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; মে, ২০০৮।
12. ঘোষ চৈতালী, নৃত্য- কলা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৪।
13. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫।
14. ঘোষ নীহার, বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মে ২০০০।
15. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬।
16. চক্রবর্ত্তী অসীম কুমার, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট বন্দর ও জনপদ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৮।
17. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১।
18. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১।
19. চক্রবর্তী রণবীর, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; শ্রাবণ ১৪১৯।
20. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০।
21. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
22. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪।
23. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২।
24. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।
25. দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য; কলকাতা; শিশুসাহিত্য সংসদ প্রা.লি.; ভাদ্র ১৩৬৭।
26. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০$^{শে}$ মে ২০০০।
27. দত্ত গোপেশচন্দ্র, কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়; কলকাতা; জিজ্ঞাসা; ২৫$^{শে}$ বৈশাখ ১৩৮৩।
28. দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।
29. দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩।
30. পান মঙ্গল, সমুদ্রগড়ের ইতিহাস; সমুদ্রগড়; ব্যানার্জী বুক সিণ্ডিকেট; ৭^{ই} ভাদ্র, ১৪১৭।
31. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪।
32. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪২১।
33. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৪।
34. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫।

35. বন্দ্যোপাধ্যায় পুলক কুমার সম্পাদিত, বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম; কলকাতা; পারুল প্রকাশনী প্রা.লি.; ২০১২।
36. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪।
37. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫।
38. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রচন্দ্র, কাব্যতীর্থ ও দাস আশুতোষ সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল; কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬০।
39. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪।
40. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৫।
41. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬।
42. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮।
43. ভট্টাচার্য ষষ্ঠীচরণ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১।
44. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯।
45. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত, চৈতন্য প্রসঙ্গ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৩৯৬।
46. ভট্টাচার্য গৌরী, বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; ৮ই চৈত্র ১৯৩৫।
47. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; কলকাতা; এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি; ২০০৬।
48. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯।
49. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১।
50. ভট্টাচার্য মালিনী, বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সম্পাদনা, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গন্থ বর্ধমান; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০২।
51. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।
52. ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, দেবতার মানবায়ন; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; জানুয়ারি ১৯৯৫।
53. ভারতী শিবশঙ্কর, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে; কলকাতা; সাহিত্যম; ২০০৯।
54. মজুমদার অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিখ খণ্ড) সংগঠন ও শৈলী বিচার; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; মাঘ ১৪১১।
55. মুখোপাধ্যায় অনিমা, পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১।
56. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪।
57. মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪০৭।
58. মুখোপাধ্যায় অতনু শাসন, বিষয়ঃ শ্রীচৈতন্য; কলকাতা; দশদিশি; নভেম্বর ২০০৯।
59. মুখোপাধ্যায় ডঃ যুগল, লৌকিক দেবদেবী ও পুরাকীর্তির আলোকে মন্তেশ্বর; কলকাতা; নব দিগন্ত প্রকাশনী; ১৪১৯।
60. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯।
61. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২।
62. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩।
63. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

64. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ফাল্গুন ১৪১৬।
65. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১।
66. শাস্ত্রী গৌরীনাথ সম্পাদিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; নবপত্র প্রকাশন; জুলাই ১৯৯৭।
67. সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।
68. সান্যাল নারায়ণ, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৬।
69. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৮।
70. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৫।
71. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬৩।
72. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫।
73. সেন সুকুমার, বটতলার ছাপা ও ছবি; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; জানুয়ারি ২০০৮।
74. সরকার সুধীরচন্দ্র সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান; কলকাতা; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি; পৌষ ১৪১২।
75. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, নির্বাচিত প্রবন্ধ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া; কার্ত্তিক ১৪১১।
76. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, বাংলার মন্দির; কলকাতা; কারিগর; জানুয়ারী ২০১২।
77. সান্যাল অবন্তী কুমার, ভট্টাচার্য অশোক সম্পাদিত, চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান; কলকাতা; সারস্বত লাইব্রেরী; ১৯৯৯।
78. সাঁতরা তারাপদ, বাংলার কাঠের কাজ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া; নভেম্বর ২০০৬।
79. সাঁতরা তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী; জানুয়ারি ২০১৪।
80. সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ১৩৪১।
81. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩।

[গ] বিভিন্ন মন্দির কর্তৃক প্রাপ্ত সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

1. চট্টরাজ তারকেশ্বর ও মণ্ডল দুর্গাপদ, শ্রীরাধাকান্তদেব সিঙ্গারকোণ শ্রীপাট; কাটোয়া; অজয় সাহিত্য পর্ষদ; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১।
2. বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস, গড়ের মা; মল্লারপুর, বীরভূম; ১৪০৯।
3. ভট্টাচার্য্য হরনারায়ণ, ঈশানীর বাঁকে মহাতীর্থ অট্টহাসের কথা; শ্রীরামপুর; ৫ই নভেম্বর ২০১১।
4. মণ্ডল দেবনাথ সম্পাদিত বর্ধমান ১০৮ শিব মন্দির; বর্ধমান; ১০৮ শিবমন্দির ট্রাস্ট বোর্ড; ১লা বৈশাখ ১৪১১।
5. শ্রী যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা; ক্ষীরগ্রাম, কাটোয়া; ১৪২০।

[ঘ] সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ

1. ***Halder Sibabrata & Halder Manju, Temple Architecture of Bengal; Kolkata; Urbee Prakashan; September 2011.***
2. ***Mccutchion David J, Late Mediaeval Temples of Bengal*; *Kolkata*; *The Asiatic Society; December 2004.***
3. ***Niyogi (Miss) Pushpa, Buddhism in Ancient Bengal; Calcutta; 1960.***

[ঙ] **সহায়ক পত্রিকা সমূহ**

1. ইনকোয়েস্ট জার্নাল; খড়গপুর; সেরা (*SERA*) ; এপ্রিল ২০১৫।
2. প্রতিবিম্ব; কালনা; ১৬ই জুলাই ২০১০।
3. ভট্টাচার্য তরুন সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা ১৪০৩; কলকাতা; প্রকাশক তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মার্চ ১৯৯৭।
4. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪।
5. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, আলপনা ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; বৈশাখ- আষাঢ়- ১৪১২।
6. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক- পৌষ- ১৪১৩।
7. মণ্ডল কাকলী সম্পাদিত লোক দর্পণ; কলকাতা; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; ২০০৩।
8. সাঁতরা তারাপদ সম্পাদিত কৌশিকী- ১, ১৯৭১- ১৯৮৮; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।
9. সাঁতরা তারাপদ সম্পাদিত কৌশিকী- ২, ১৯৭১- ১৯৮৮; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

গবেষক– **জয়া বিশ্বাস**

তত্ত্বাবধায়ক– **অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু , অধ্যাপক ড. সৌভিক মজুমদার**

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা–৩২

Souvik Majumdar.

Dr. Souvik Majumdar
Associate Professor
Kabi Joydeb Mahavidyalaya
Illambazar, Birbhum.

Soumitra Basu
7-6-2022

Dr. Soumitra Basu
Sisirkumar Bhaduri Professor,
Dept. of Drama (Retd.)
University of Rabindra Bharati

Jaya Biswas
15/06/2022